মর্যাদা ও গৌরবের উৎস মহানবী

মুহাম্মদ ইকবাল

প্রতিটি মুমিনের অন্তরেই তারপ্রকৃত মাহবুব হযরত মহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি-ভালবাসার সর্বোচ্চ স্থান দখল করে আছেন। কারণ, তিনিই যে মুমিনের প্রকৃত প্রেমাস্পদ এবং মাহবুব, তাঁরই প্রেম-মাধুরী মুমিনের অন্তরে শক্তি ও সাহস যোগায়, জীবনীশক্তিহীন আত্মায় নবচেতনার সঞ্চার করে। মানুষ যখন আত্মমর্যাদা ও আত্মপরিচয় বিস্মৃত হয়ে অধঃপতনের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছিলো, মানবতার এমনি এক দুর্দিনে বিশ্বমানবের প্রকৃত সুহৃদ ও কল্যাণকামী, ত্রাণকর্তা ও মুক্তিদাতা হযরত মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুক্তির জিয়নকাঠি নিয়ে আবির্ভূত হন। আত্মভোলা মানুষকে তিনি আত্মোপলব্ধির আহবান জানান, পথহারা মানুষকে তিনি দান করেন সঠিক পথের সন্ধান। তাঁর প্রদর্শিত পথের পথিক হয়েই মুমিন আত্মপরিচয় লাভে ধন্য হয়েছে, পেয়েছে মুক্তিপথের সন্ধান। তাই তার অন্তরে এই মহামানবের প্রতি এত শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেমসুধার অন্তহীন ফল্গুধারা সদা প্রবাহিত। দুনিয়ার যে কোন ব্যক্তি ও বস্তুর তুলনায় তাঁরই প্রতি মুমিনের সর্বাধিক হার্দ্য আকর্ষণ। কারণ, তাঁরই বদৌলতে মুমিন তার হারানো সম্পদ ফিরে পেয়েছে, স্রষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে তার সান্নিধ্য লাভের পথ খুঁজে পেয়েছে।

> চরম অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত জিন্দেগীর গ্লানিমুক্ত হয়ে উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ জিন্দেগীর আস্বাদ ফিরে পেয়েছে। জগতের বুকে নিজেদের জন্যে এক মর্যাদাপূর্ণ আসন নির্ণয় করে নিতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও চারিত্রিক দিক থেকে একটি উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্বদরবারে স্থান অধিকার করে নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। আর এই সব কিছুই সম্ভব হয়েছে নবী হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর বদৌলতে। কারণ, তিনিই বিশ্ববাসীকে এক উন্নত জীবনবিধান, এক উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থা ও উন্নত সভ্যতা উপহার দিয়েছেন। মুসলিমগণ এই সম্পদে সম্পদশালী হয়েই গৌরব ও মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়েছে। কাজেই মুসলিম মিল্লাতের সকল প্রকার গৌরব ও মর্যাদার উৎসই হচ্ছেন নবী মুস্তফা (সাঃ)।

আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস হলো, ইসলাম ধর্ম হিসেবে আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত এক রব্বানী হিদায়াত, সমাজ ও রাষ্ট্র হিসেবে নির্ভরস্থল একমাত্র নবী মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র সত্তা।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু নবীয়ে করীম (সাঃ)-এর রিসালতের বদৌলতেই আমাদের অন্তরে তওহীদের জীবন সঞ্চার হয়েছে। তৎপূর্বে আমরা মূলত শব্দহীন অক্ষর বিশেষের ন্যায়ই ছিলাম। হুযুর (সাঃ)-এর রিসালত তা সুবিন্যস্ত করতঃ অর্থবহ শব্দে রূপান্তরিত করেছে। রিসালতের দ্বারাই জগতে আমাদের অস্তিত্বে স্থায়িত্ব, রিসালতের মাধ্যমেই আমাদের ধর্ম ও আইন-কানুন।

আমরা উম্মতে মুহম্মদীগণ সংখ্যায় লক্ষ কোটি যাই হই না কেন, রিসালতের বদৌলতে আমরা এক ও অভিন্ন সত্তা, আমরা পরস্পর একটি পূর্ণাঙ্গ দেহের অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সদৃশ।

হযরত নবীয়ে আকরাম (সাঃ)-এর পবিত্র রিসালতের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো এমন একটি সমাজ গঠন করা, যার যাবতীয় আইন-কানুন খোদায়ী বিধানের অনুবর্তী হবে। ভিন্ন কথায়, স্থান-কাল-পাত্র ও ভৌগোলিক সীমারেখা, গোত্র, ভাষা ও সংস্কৃতির নামে দুনিয়ার

বিভিন্ন জাতি ও দেশে যে সমস্ত ভেদাভেদ প্রথা বিদ্যমান, তা সমূলে উৎসাদনই মহানবী (সাঃ)-এর রিসালতের চরম লক্ষ্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য। ইসলাম মূলতঃ ধর্মভিত্তিক এক মহাজাতির নাম, যার সীমা ও চৌহদ্দীঃ

এক, তওহীদ অর্থাৎ অনাদি ও অনন্ত সত্তা মহান আল্লাহর একত্বের উপর ঈমান।

দুই, রিসালত অর্থাৎ সকল নবী-রসূল (আঃ)-এর ওপর ঈমান।

তিন, খতমে নবুওয়ত অর্থাৎ হযরত নবী করীম (সাঃ)-ই যে শেষ নবী, তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না, এই সত্যের ওপর দৃঢ় ঈমান। আর এই শেষোক্ত আকীদাই মূলতঃ একজন মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্যে প্রকৃষ্ট মাধ্যম।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে খতমে নুবওয়ত এক অভিনব চিন্তাই মনে হবে। কিন্তু প্রাক-ইসলামী যুগের অগ্নিপূজক সমাজের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতি একটু গভীর সৃষ্টি দিলে এই সংশয় সহজেই বিদূরিত হয়ে যায়। কারণ, হযরত নবী করীম (সাঃ) যেহেতু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিধান সম্বলিত এক পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী জীবনবিধান আনয়ন করেছেন, সেহেতু, অতঃপর, কোন নতুন নবী ও শরীয়তের প্রয়োজনই থাকে না। অথচ ইতিপূর্বে মানব জাতির প্রয়োজনের তাগিদেই আল্লাহ্ পাক নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন আর এই প্রয়োজন পরিপুর্ণরূপে পূরণ হওয়ার নামই খতমে নবুওয়ত। অতএব একে অভিনব মনে করার কোন কারণ থাকে না, বরং এ-ই বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত।

হযরত নুহ (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম শরীয়ত প্রবর্তনের ধারাবাহিকতা আরম্ভ করেন। তৎপূর্ববর্তী নবীগণ শুধু সামাজিকতা শিক্ষাদান কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন, শরীয়ত বা খোদায়ী বিধান প্রচারের দায়িত্ব হযরত নূহ (আঃ) থেকেই আরম্ভ হয়। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে তা ক্রমে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নবী-রসূলের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করতে থাকে। আর হযরত নূহ (আঃ) কর্তৃক সূচনাকৃত সেই শরীয়তই হযরত মুহম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাতে পরিপূর্ণতা অর্জন করে। মানবজাতির জন্যে আল্লাহ্ তা□আলার দেয়া বিধান যেহেতু পূর্ণতার লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে, কাজেই কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী-রসূলের আবির্ভার হবে না, কোন নতুন শরীয়ত প্রবর্তিত হবে না। কাজেই হযরত মুহম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বশেষ নবী, তাঁর শরীয়ত সর্বশেষ শরীয়ত, তাঁর প্রতিষ্ঠিত মিল্লাত সর্বশেষ মিল্লাত-মুসলিম মিল্লাত।
আল্লাহ্ পাক আমাদের উপর শরীয়ত পরিপুর্ণ করে দিয়েছে, আমাদের নবী (সাঃ)-র ওপর রিসালত পরিসমাপ্ত করেছেন। এখন আমরাই বিশ্ব মহফিলের আলোকবর্তিকা। হুযুর (সাঃ) নবুওয়তকে পরিসমাপ্ত করেছেন, আর আমরা জাতিসমূহ নিঃশেষিত কিরেছি, (অর্থাৎ আমাদের পরে এই পৃথিবীতে কোন নতুন জাতির অভ্যুদয় ঘটবে না)। অতঃপর বিশ্ব মহফিলের □সাকী□র দায়িত্ব পালনের জিম্মা আমাদের ওপরই অর্পিত হয়েছে। কারণ সর্বশেষ পাত্রটিই সোপর্দ করা হয়েছে আমাদের হাতে। (পিপাসার্ত মানুষ যেমন □সাকী□র শরণাপন্ন হয়, তেমনি দুনিয়ার জাতিসমূহ হিদায়তপ্রাপ্তির জন্যে আমাদের শরণাপন্ন হবে।)

হযরত মহানবী (সাঃ)-র ঘোষণা □□□□ □□□ □□ □□আমার পরে আর কোন নবী নেই।□□- বস্তুত আমাদের ওপর এ এক বিরাট খোদায়ী ইহসান। এর দ্বারাই আমাদের ধর্মের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ইহসানই আমাদের জাতির শক্তির উৎস, এই ইহসানই জাতীয় সংহতি রক্ষার চাবিকাঠি।

ইসলামের সংহতি ও বিশ্ব-মুসলিমের সৌভ্রাতৃত্ব উপরোক্ত মৌলিক বিশ্বাসের ওপরই সম্পূর্ণ নিভ্রশীল। এরই মাধ্যমে বিশ্ব-মুসলিমের মধ্যে অধিকতর সৌহার্দ সম্প্রীতি গড়ে উঠবে, যার বদৌলতে মুসলিমগণ বিশ্ব রাজনীতিতে নিজ মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সাফল্য অর্জন করবে। রাজনৈতিকভাবে ইসলামের সংহতি তখনই বিনষ্ট হতে থাকে, যখন কোন একটি মুসলিম রাষ্ট্র অপর একটি মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ঠিক তেমনিভাবে, ইসলামের ধর্মীয় সংহতি তখনই নষ্ট হওয়া আরম্ভ করে, যখন কোন একটি বা একদল মুসলমান ইসলামের উপরোক্ত মৌলিক বিশ্বাসের যে কোন একটি বা আরকানে ইসলামের কোন একটি রুকন অমান্য করতে থাকে। এমনকি এই সমস্তের প্রতি সামান্যতম শৈথিল্যও মিল্লাতের ঐক্য-সংহতির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর।

বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যিকার শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যদি একক সমাজ-দর্শনের চিন্তা করা হয়, তবে ইসলামই একমাত্র উপায়, যার মাধ্যমে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। কারণ পবিত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে মূলতঃ কোন সমাজ-দর্শনই নেই। ইসলাম মানব জাতিকে এমন একটি সমাজ-দর্শন উপহার দিয়েছে, যাকে সত্যিকারভাবে অনুসরণ করা হলে সমগ্র বিশ্বমানবগোষ্ঠী এক অভিন্ন সমাজের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। সুতরাং ইসলামী মিল্লাতের মাধ্যমেই স্থায়ী বিশ্বশান্তির পথ উন্মুক্ত হওয়া সম্ভব।

পবিত্র কুরআনের সুদীর্ঘ কালব্যাপী অনুশীলনের মাধ্যমে আমি যে ধারণা লাভ করেছি তা হলোঃ ইসলাম শুধু ব্যক্তির চারিত্রিক সংশোধনই কামনা করে না, বরং সমগ্র মানব জাতির সমষ্টিগত জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। গোত্রীয় ও আঞ্চলিক সংকীর্ণ চিন্তাধারার আবর্ত থেকে মুক্তিদান করে গোটা মানবজাতিকে আন্তর্জাতিক মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ করাই ইসলামের প্রধানতম লক্ষ্য।

বিভিন্ন জাতির ধর্মীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রাক-ইসলামী যুগে যে সমস্ত ধর্ম প্রচলিত ছিল সে-সব ছিল স্বভাবতঃ জাতিভিত্তিক ধর্ম। যেমন -মিসরীয় ধর্ম, গ্রীক ধর্ম, ইরানী ধর্ম, ভারতীয় ধর্ম ইত্যাদি। অতঃপর তা বংশ ও গোত্রীয় ধর্মের রূপ লাভ করে; যেমনঃ- বনী ইসরায়ীলের ধর্ম। তারপর হযরত ঈসা (আঃ)-র অনুসারিগণ ধর্মকে ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক পর্যায়ে নামিয়ে আনেন। তখন থেকেই ইউরোপীয়গণ এই ধারণা পোষণ আরম্ভ করে যে, মানবের সমষ্টিগত ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এককভাবে রাষ্ট্রের, ধর্মের সেখানে কোন দায়দায়িত্ব নেই। কিন্তু পবিত্র ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা সর্বপ্রথম বিশ্বমানবকে এই বাণী শুনিয়েছে যে, ধর্মের ভিত্তি জাতীয়তা বা গোত্র-বর্ণের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং তা নিছক ব্যক্তিগত বা আধ্যাত্মিকও নয়, বরং তা নিছক ব্যক্তিগত বা আধ্যাত্মিকও নয় বরং তা আন্তর্জাতিক মানবতাকেন্দ্রিক। সমগ্র মানব জাতিকে সকল প্রকার প্রকৃতিগত বৈষম্য সত্ত্বেও একই জীবন বিধানের অধীনে সংঘবদ্ধ করাই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য। আর যে ধর্মের ভিত্তি এরূপ ব্যাপক ও সুবিস্তৃত, তা নিছক কতিপয় আকীদা বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানে সীমিত থাকতে পারে না। তার কর্মক্ষেত্র যেমন ব্যাপক ও সুবিস্তৃত, তেমনি এর লক্ষ্যও ব্যাপক ও সামগ্রিক। ব্যক্তির জীবনের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সকল দিক নিয়ন্ত্রণই এর পরিধির অন্তর্ভূক্ত। মোটকথা, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিশ্বজনীন জীবনদর্শন, যা কোন বিশেষ স্থান, বিশেষ কাল ও বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

এ-কথা চিরন্তন সত্য যে, ইসলাম গির্জাভিত্তিক মতবাদ নয়। ইসলাম পরিপূর্ণরূপেই একটি রাষ্ট্রদর্শনের নাম। এ এক সুসংহত ও সুশৃঙ্খল জীবন-বিধানরূপেই আবির্ভুত হয়েছে এবং এমন এক সময় আবির্ভুত হয়েছে, যখন সমকালীন বহুল প্রচারিত আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণাও জন্ম লাভ করেনি। এর মধ্যে উন্নত চরিত্রের সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীই বিদ্যমান, যদ্দারা মানুষ শুধু নিছক সৃষ্টিই নয়, তৎসঙ্গে তারা বিশ্বস্রষ্টার প্রতিনিধিও বটে।

একজন অমুসলিম ইউরোপীয় পণ্ডিতের মুখে যদিও একথা শোভা পায় যে, ধর্ম নিছক একটি ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক ব্যাপার, কিন্তু তা কোন মুসলমানের মুখে কোনক্রমেই শোভা পায় না। কারণ, ইসলাম খ্রীস্ট ধর্মের ন্যায় ধর্মকে নিছক গির্জা ও মসজিদকেন্দ্রিক মনে করে না। ইউরোপে খ্রীস্ট ধর্ম একটি গির্জাকেন্দ্রিক মতবাদ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাদের ধারণা, ধর্ম জড়জগতের কলুষতামুক্ত এক আধ্যাত্মিক মতবাদ। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এই ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণহীনতার পরিণাম খ্রীস্টজগতে যা হওয়ার তাই হয়েছে। স্বৈরাচারিতা ও স্বেচ্ছাতারিতার অবাধ রাজত্ব কায়েম হয়েছে। কিন্তু ইসলাম ব্যক্তির জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, মানুষ যেমন আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তদ্রুপ তার জীবনের সকল ক্ষেত্র ও দিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সেই আল্লাহ্‌র। আর তাই স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবজাতির জীবনের সকল ক্ষেত্রই খোদায়ী অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

কিছু সংখ্যক মুসলমান যদি এই ধারণা পোষণ করে থাকে যে, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম একই সাথে পাশাপাশি চরতে পারে, তবে আমি তাদেরকে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে দিতে চাই যে, এর পরিণতি হিসেবে ধর্ম শেষ পর্যন্ত অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। তা যদি নাও হয়, তবে ধর্ম রাষ্ট্রীয় মর্যাদা হারিয়ে নিছক ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পরিণত হওয়ার ফলে ধর্মহীনতার যে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেবে, তার ফলে তখন জাতিকে কোনক্রমেই আদর্শ ও মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও নৈতিক চরিত্রে বলীয়ান করে গড়ে তোলা যাবে না।

পৌত্তলিকতার নবসৃষ্টির মধ্যে দেশই অন্যতম। এর বাহ্যিক বহিরাবরণ ধর্মের জন্যে কাফনস্বরূপ।

আমি জীবনের প্রারম্ভিক যুগ থেকেই পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধাচরণ করে আসছি। তখন শুধু উপমহাদেশই নয়, বরং গোটা মুসলিম বিশ্বই এর পরিণতি সম্পর্কে কিছুই অবগত ছিল না। পাশচত্য লেখকগণ বহু পূর্বেই অবহিত করেছেন যে, এ হলো ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের এক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অঙ্গবিশেষ। ইসলামের এক ও অছিন্ন জাতীয়তাবাদকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এই ষড়যন্ত্র রচিত হয়েছিল। মুসলিম দেশসমূহে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার স্বপক্ষে ব্যাপক প্রোপাগান্ডা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তারা এই ষড়যন্ত্রে কিছুটা সাফল্যও লাভ করে।

ইসলামী সৌভ্রাতৃত্ববোধ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, প্রত্যেকটি দেশই এক একটি স্বতন্ত্র জাতির গোড়াপত্তন করেছে, যখনই

ভৌগোলিক সীমারেখাকে জাতীয়তার মাপকাঠি স্থির করা হয়েছে, তখনই মানব জাতিকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে দেয়া হয়েছে। আত্মা দেহ ছেড়ে উড়ে গেছে, শুধু আত্মাহীন কায়াই পড়ে আছে এবং এই ধ্বংসাবশেষের ওপরই বিভিন্ন জাতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

দেশ ও আঞ্চলিকতার এই সংকীর্ণতার দ্বারা মানুষের চিন্তাধারা স্বভাবত ঐ দিকেই ধাবিত হয়, মানবজাতি তদ্দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এর পরিণতি এত ভয়াবহ রূপ ধারণ করে যে, অতঃপর পুনরায় এসবকে আর সংঘবদ্ধ করা সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া ধর্মও তখন প্রত্যেক দেশ ও অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে, যেমন প্রাক-ইসলামী যুগের ধর্মসমূহের অবস্থা ছিল। বর্তমানেও পৃথিবীতে অনেক ধর্ম আছে, যেগুলো এই আঞ্চলিক সংকীর্ণতার বেড়াজালে আবদ্ধ থাকার কারণে বহির্বিশ্বে সম্প্রসারণ লাভ করতে পারেনি। অধিকন্তু এর ফলে মানুষ ক্রমেই ধর্ম সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয়বাদী হয় অবশেষে ধর্মহারা হয়ে নাস্তিকতার আশ্রয় গ্রহণ করে।

আধুনিক জাতীয়তাবাদে নাস্তিকতার এই বিষাক্ত জীবাণূ লক্ষ্য করে আমি প্রথম থেকেই এর বিরুদ্ধাচরণ করে আসছি। কারণ, আমার দৃষ্টিতে দেশপ্রেম এবং দেশপূজা এক কথা নয়। দেশই মানুষের চরম লক্ষ্য নয় বরং ঈমান, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যই মানুষের মূল লক্ষ্য। এবং মানুষ যদি বেঁচে থাকে, তবে এসবের ওপর ভিত্তি করেই বেঁচে থাকবে আর জীবন উৎসর্গ করতে হলেও তজ্জন্যই করবে।

আধুনিক বিশ্বে আরেকটি সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তা হলো বর্ণ ও গোত্রবাদ। আমার মতে মানব সভ্যতার ললাটে এ এক মারাত্মক কলঙ্কটিকা। এশীয়গণ যদি ইউরোপের অনুরূপ অবস্থা নিজেদের জন্যে পছন্দ না করে, তবে তাদেরকে কাল-বিলম্ব না করেই ইসলামের আন্তর্জাতিক চিন্তাধারাকে মানবতাবাদ গ্রহণ করা উচিত। বর্ণগত ও গোত্রীয় ভোদাভেদ ভুলে ইসলামের আন্তর্জাতিক মানবতাবাদ গ্রহণ করাই তাদের জন্যে বিধেয়।

মানবজাতির ইতিহাস পারস্পরিক হানাহানি, ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও গৃহদ্বন্দ্বে ভরা। এমতাবস্থায় তার পক্ষে এমন একটি জীবনের ভিত্তি নির্মাণ আদৌ সম্ভব ছিল না, যদ্দ্বারা মানবজীবনের ভিত্তি শান্তি-শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ-সমপ্রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। পবিত্র ইসলাম তওহীদের ঐক্যসূত্র গ্রথিত করে মানুষকে সেই সামগ্রিক ও পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান লাভের যোগ্য করে দিয়েছে। কিন্তু এরূপ পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক জীবনবিধান খুঁজে বের করা বা স্বয়ং রচনা করা মানব জাতির পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই মহান আল্লাহ্ তদীয় রসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে তা জগৎবাসীর জন্যে অবতারণ করেন। আমার সাড়া জীবনের অভিজ্ঞতা হোল, আমি পবিত্র ইসলামের বিধানসমূহ রাষ্ট পরিচালনার নীতিমালা, তার সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইতিহাস ও সাহিত্যকে গভীর অভিনিবেশ সহকারে অনুশীলন করেছি; তাতে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ইসলাম এক আন্তর্জাতিক জীবন বিধান।

মুসলমানগণ সামাজিকভাবে এক সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ জাতি, যার ভিত্তিপ্রস্তর তৌহীদ ও খতমে নবুওয়াতের আকীদা-বিশ্বাসের ওপর স্থাপিত। এতে বর্ণ গোত্র আঞ্চলিকতার চিন্তাধারার কোনই অবকাশ নেই। মুসলমানের আল্লাহ্ যেমন রাব্বুল আলামীন-বিশ্বপ্রভু, মুসলমানের নবীও তেমন রাহমাতুল্লিল আলামীন-বিশ্বনবী। মুসলমানের ধর্ম বিশ্বজনীন ধর্ম। ইসলামের অনুসারিগণও তেমনি এক বিশ্বজাতি-মুসলমান। এই কারণে পবিত্র কুরআন মজিদ মানুষকে এই একই মহাজাতির আওতাভুক্ত হওয়ার আহবান জানিয়েছে। মানুষ যখন ঐ আহবানে সাড়া দিয়ে তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তখনই তাকে মিল্লাত ও উম্মাহ রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ফলে যে কেউই ইসলামের নবী হযরত মুহম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করে ইসলামের গণ্ডিভুক্ত হয়ছে, তা থেকেই সে ব্যক্তি ঐ মিল্লাতে ইসলামী ও উম্মতের মুসলিমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। একদিন সে অঞ্চল ও গোত্রের দসত্ববন্ধনে আবদ্ধ ছিল, ইসলাম তাকে সেই দাসত্ব থেকে সাধীনতা দান করে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দান করেছে। এখন থেকে ঐ গোত্র ও অঞ্চল তার দাসত্ব-শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে প্রভুর আসনে সমাসীন হয়েছে। ইসলামের আন্তর্জাতিক মানবতাবাদই বিশ্ব-শান্তি ও বিশ্বমানব মুক্তির একমাত্র মহাসনদ। এ-ই মুসলিম মর্যাদার একমাত্র বাহন। আর যে মহামানবের বদৌলতে আমরা এই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানরূপ ধর্ম লাভ করেছি, সেই নবী মুস্তফা (সাঃ)-ই আমাদের মর্যাদা ও গৌরবের উৎস।

মুহাম্মদ ইকবাল

ইতিহাসের এক অশান্ত পরিবেশে ১৮৭৭ খৃস্টাব্দের ৯ নভেম্বর শুক্রবার ফজরের আযানের সময় বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোট নগরীতে এক মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একতলা একটি জীর্ণ বাড়ির যে প্রকোষ্ঠে তার জন্ম তা এখনও পাকিস্তান সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত। দেশ-বিদেশের পর্যটকদের জন্য এটি একটি দর্শনীয় বাড়ি। ইকবালের পূর্ব-পুরুষগণ কাশ্মীর থেকে হিজরত করে শিয়ালকোটে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ নূর মুহাম্মদ। তিনি ছিলেন শিয়ালকোটের অন্যতম টুপি ব্যবসায়ী। মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশু ইকবাল মাওলানা গুলাম হাসান ও সৈয়দ মীর হাসানের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্কচ মিশন স্কুলের শিক্ষক সৈয়দ মীর হাসান মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনে খুব আগ্রহী ছিলেন। পিতা শেখ নূর মুহাম্মদের অনুমতিক্রমে ইকবালকে তিনি স্কচ মিশন স্কুলে ভর্তি করেছেন। প্রাথমিক স্তর থেকে এফএ পর্যন্ত দশ বছরকাল তিনি সৈয়দ মীর হাসানের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাগ্রহণ করেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সৈয়দ মীর হাসান অভিনব পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে তরুণ ইকবালের মানে ঐকান্তিক পিপাসা জাগিয়ে তোলেন। ১৮৮৮ সালে প্রাথমিক, ১৮৯১ সালে মিডল এবং ১৮৯৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি ও মেডেলসহ উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৫ সালে ইকবাল ঐ কলেজ থেকে এফএ পাস করেন এবং একই বছর ১৮ বছর বয়সে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে লাহোর গমন করেন। লাহোর সরকারি কলেজ থেকে ১৮৯৭ সালে স্নাতক ও ১৮৯৯ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। একই বছর তিনি লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রে অধ্যাপনার চাকরি গ্রহণ করেন।

১৯০১ সালে লাহের সরকারি কলেজে ইংরেজি ও দর্শন শাস্ত্রে সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইংরেজি, আরবি ও দর্শনে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনকারী ইকবালের শিক্ষা জীবনে দ্বিতীয় শিক্ষক মীর হাসানের গভীর জ্ঞান এবং কলেজ জীবনে দর্শনের শিক্ষক টমাস আরনল্ড তার জীবনে প্রবল প্রভাব প্রতিফলিত করেন। টমাস আরনল্ডের উৎসাহে ১৯০৮ সালে যুক্তরাজ্যের Lincoln□s Inn থেকে ব্যারিস্টারী ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি পাশাপাশি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। জার্মানী থেকে ১৯০৭ সালে দর্শনে পিএইচডি অর্জন করেন। ১৯১২ সালে এক নতুন ইকবাল স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তদানীন্তন বিশ্বপরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের অধঃপতনে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর থেকে ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্যেও নেমে এসেছিল চরম দুর্দিন। সেই যুগসন্ধিক্ষণে যেসব তরুণ মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাদের সম্মুখ ভাগে ছিলেন আধুনিক বিশ্বে ইসলামের সময়োপযোগী ব্যাখ্যাকার, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের অগ্রসেনা, মানবতার মুক্তিকামী বিদ্রোহী কলম যুদ্ধের অকুতোভয় সৈনিক মহাকবি ইকবাল। ইকবাল তন্দ্রাচ্ছন্ন মুসলিম জাতিকে আমৃত্যু কাব্যের চাবুক মেরে জাগ্রত করার প্রয়াস পান। সে সময়ের প্রেক্ষাপটে এমন কোন দিক ছিল না, যে বিষয়ে তিনি তার মেধাকে ব্যবহার করেননি। কাশ্মীর, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, স্পেন, ইন্দোনেশিয়াসহ প্রতিটি রাষ্ট্রের সমস্যা নিয়েই তিনি দিক-নির্দেশনা সম্বলিত দরদমাখা কাব্য রচনা করেন। মুসলিম জাতি তাঁর কাব্যে ইতিহাস-ঐতিহ্য ও হৃত গৌরবের কথা স্মরণ করে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকে। তাদের সম্বিৎ ফিরে আসতে শুরু করে। ইকবাল নিছক কবি বা দার্শনিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিকও। সবচেয়ে বড় কথা, ইকবাল ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী কবি, ভাবুক ও রাজনীতিক। গতানুগতিকতার সোজাপথ ছেড়ে যে কবি-দার্শনিক সম্পূর্ণ এক নতুন পথে এগিয়ে গেছেন, তিনিই হলেন মহাকবি আল্লামা ইকবাল। তিনি কাব্যকে করেছেন জাতি গঠনের হাতিয়ার। এই বিশাল ব্যক্তি উর্দু, ফার্সি ও ইংরেজি ভাষায় মুসলিম উম্মাহকে যে পথের দিশা দিয়ে গেছেন, তা সম্পূর্ণ কুরআন, হাদিস, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্যের নির্যাস। তার রচনা সমগ্রে মিশে আছে ইসলাম। ইকবাল □আর্ট ফর আর্টস সেক□-এ বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিল্প জীবনের জন্য। আর সেজন্যই তিনি নির্জীব জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কবিতাকে ব্যবহার করেন।

তাঁর পদ্য গদ্য যেকোন রচনার উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র মুসলিম মিল্লাত, মুসলিম জাতির ঐক্য ও সংহতি। তিনি মুসলিম বিশ্বকে এক প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আমৃত্যু কলম সৈনিক হিসেবে সংস্কার আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। ইকবালের প্রত্যাশা ছিল, ইসলাম একদিন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেই। একজন মহৎ মানবতাবাদী কবি হিসেবে যেমন রয়েছে তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, তেমনি ইসলামের অতি আধুনিক ব্যাখ্যাদাতা হিসেবেও তিনি সমান গৌরবের অধিকারী। কুরআনুল করীমের বিশাল প্রাঙ্গণ, হাদীস শরীফ এবং ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ছিল ইকবাল কাব্যের সারবস্তু। ইসলামকে তিনি একটি গতিহীন ধর্মের কতকগুলো সূত্র সর্বস্ব ব্যবস্থা পত্র মনে করতেন না। তাঁর কাছে ইসলাম ছিল এক প্রাণপ্রাচুর্য্য উন্নত জীবনের প্রতীক। ইকবালকে উর্দু ভাষার কবি বলা হলেও একই সঙ্গে তিনি উর্দু ও ফার্সি ভাষার কবি। ইকবালের ১১টি কাব্য গ্রন্থের মধ্যে ৮টি ফার্সি ভাষায় ও ৩টি উর্দু ভাষায় লিখিত। তাঁর কবিতা লেখার সময়কাল ১৯০৮ থেকে ১৯২৪ খৃস্টাব্দ। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগন্থ □শিকওয়া□ এবং □জবাব-ই-শিকওয়া□। ১৯১৫ সালে আসরারে-ই-খুদী এবং ১৯১৮ সালে রমুয-ই-বেখুদী□ প্রকাশিত হয়। ১৯৩২ সালে ইকবালের □জাবিদলামা□ প্রকাশিত হয়। ফার্সি ভাষায় রচিত এই কাব্যগ্রন্থ কনিষ্ঠপুত্র জাবিদের নামে নামকরণ করেন তিনি।

আল্লামা ইকবালের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ :ইলম আল ইক্তিউদ (The Science of Economics)- উর্দু ছন্দে (ca ১৯০১), Islam as an Ethical and Political Ideal- ইংরেজি (১৯০৮), The Development of Metaphysics in Persia- ইংরেজি (১৯০৮) (বাংলা অনুবাদ : প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান),আসরার ই খুদি (The Secrets of the Self)- ফার্সি (১৯১৫, রুমিজ ই বেখুদি (The Mysteries of Selflessness)- ফার্সি (১৯১৭), পয়গাম ই মাশরিক (The Message of the East)- ফার্সি (১৯২৩), বাং ই দারা (The Call of the Marching Bell)- উর্দু ও ফার্সি (১৯২৪), জুবুর ই আজাম (The Psalms of Persia)- ফার্সি (১৯২৭), The Reconstruction of Religious Thought in Islam- (ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন) (১৯৩০), জাভেদ নামা (The Book of Eternity)- ফার্সি (১৯৩২), বাল ই জিবরাইল (The Gabriel□s Wings)- উর্দু ও ফার্সি (১৯৩৩), পাস ছে বায়াদ কারদ আই আক্ওয়াম ই শারক (So What Should be Done O Oriental Nations)- ফার্সি (১৯৩৬)-, মুসাফির (The Wayfarer)- ফার্সি (১৯৩৬), জারব ই কালিম (The Blow of Moses) উর্দু ও ফার্সি (১৯৩৬)। আরমাঘান ই হিজাজ (The Gift for Hijaz)- ফার্সি ও উর্দু (১৯৩৮)।

আল্লামা ইকবালের জীবন ও কাব্যে জালাল উদ্দিন রুমির প্রভাব অত্যধিক। মিরাজ এ রসুল (সাঃ)-এর সঙ্গী ছিলেন জিবরাইল (আ:), আর ইকবালের ঊর্ধ্বলোকের সফরসঙ্গী মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইকবাল কেবলমাত্র কবিতা বা কাব্য লেখকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অতিউচ্চ মানের চিন্তাশীল প্রবন্ধ লেখকও। আল্লামা ইকবালের চিন্তার গভীরতার জন্যই ইকবালের কবিতা শুধু মুসলমানের জন্য নয়, গোটা বিশ্বমানব সমাজের জন্য হয়ে ওঠে নতুন চিন্তার দিকদর্শন। কেননা তিনি যে সংকট ও সমস্যার কথা চিন্তা করেছিলেন তা শুধু মুসলিম সমাজের নয়, বিশ্বসমাজের সমস্যা।

ইকবালের অসংখ্য কাব্য, প্রবন্ধের মধ্যে □আসরার-ই-খুদী□কে বলা হয় ইকবালের শ্রেষ্ঠ রচনা □Masterpiece□। ইকবাল ১৯০৮ সালে All India Muslim League-এর সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ১৯২৬ সালে পাঞ্জাবের লেজিসলেটিব কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৭-২৮ সালের ৫ মার্চ পাঞ্জাব আইনসভার বাজেট অধিবেশনে ভাষণ দেন। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত All Party Muslim Conference-এ ভাষণ এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র কার্যক্রম গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। তিনি এলাহাবাদে মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি স্বতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রস্তাব পেশ করেন এবং পরবর্তীতে পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনের কারিগর হিসেবে দার্শনিকতার কাজ করে তাঁর চিন্তাগুলো। আল্লামা ইকবালের এক ছেলে ড. জাবেদ ইকবাল ও এক মেয়ে মুনীরা। তিনি ১৯৩৮ সালের ২১ এপ্রিল ভোর ৫টা ১৪ মিনিটে চতুর্দিকে ফজরের আযান ধ্বনির মধ্যে ৬০ বছরের কিছু উর্ধ্বে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।